OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 70
Website: https://tirj.org.in, Page No. 597 - 607
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 597 - 607
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

ব্যোমকেশ মুস্তফীর 'রোগশয্যার প্রলাপ' : বাঙালি জীবনের সেকাল ও একাল

সঙ্গীতা পাঁজা
গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : sangitap479@gmail.com

Received Date *25. 06. 2025*
Selection Date *20. 07. 2025*

Keyword
Illness, Docto, Vaidya Jati, Education System, Widow, Palligram, Town, Social Work.

Abstract
Byomkesh Mustafee wrote the book 'Rogshyar Prolap' under the pseudonym 'Sreerogatur Sharma'. While he was associated with the Bengali Sahitya Parishad, he contrcted a fever due to his long-term tireless work and became bedridden. Even in such a sickly mental state, his deep thoughts on various issues related to Bengali life in the 19th and 20th centuries are evident. My aim is to shed light on how various aspects of Bengali life are reflected in the book 'Rogshyar Prolap' written by Byomkesh Mustafee. We will understand that he gradually accumulated experience and observed Bengali life. At the same time, he tired to clearly grasp the changes in the lifestyle of the people of that time and its flow based on the comperative position of that time and time.

Discussion

ব্যোমকেশ মুস্তফী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জীবনের প্রথম দিকে তিনি হাইকোর্টে চাকরি করেছেন। কিছুদিন পরে চাকরি ছেড়ে দিয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন আমৃত্যু। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি পত্রিকায় সাহিত্য লেখালেখির কাজও করেছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। তিনি পাঠকসমাজে প্রাবন্ধিক হিসেবেই পরিচিতি পেয়েছেন। প্রাবন্ধিক ব্যোমকেশ মুস্তফীর অসাধারণ একটি প্রবন্ধ সংকলন-গ্রন্থ হল 'রোগশয্যার প্রলাপ'। গ্রন্থটিতে মোট ষোলোটি প্রবন্ধ একত্রে স্থান পেয়েছে। তবে তাঁর মৃত্যুর পরে এই গ্রন্থ সংকলিত প্রবন্ধগুলো পত্রিকায় এবং গ্রন্থাগারে প্রকাশ পেয়েছে। ব্যোমকেশ মুস্তফীর রচনাগুলো ধারাবাহিক ভাবে 'মানসী' পত্রিকায় ১৩১৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে ১৩২২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশ পেয়েছে। তারপর অবশিষ্ট অংশটুকু 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'-র ১৩২৩ বঙ্গাব্দের জৈষ্ঠ্য ও আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশ পেয়েছে। পরবর্তীকালে ১৩৩০ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে নলিনীরঞ্জন পন্ডিতের সম্পাদনায় প্রবন্ধগুলো একসঙ্গে 'রোগশয্যার প্রলাপ' নামে গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয়। ব্যোমকেশ মুস্তফীর সুহৃদ খগেন্দ্রনাথ চট্টপাধ্যায়কে এই সংকলন গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়।

ব্যোমকেশ মুস্তফী 'শ্রীরোগাতুর শর্ম্মা' ছদ্মনামে 'রোগশয্যার প্রলাপ' গ্রন্থটি লেখেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে যুক্ত থাকাকালীন দীর্ঘদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে জ্বরবিকারে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। এহেন রোগজর্জর মানসিক অবস্থাতেও তৎকালীন ঊনিশ-বিশ শতকের বাঙালি জীবন সম্পর্কিত বিবিধ বিষয় নিয়ে তাঁর সুগভীর চিন্তাভাবনার পরিচয়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 70
Website: https://tirj.org.in, Page No. 597 - 607
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পাওয়া যায়। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যোমকেশ মুস্তফীর রচিত 'রোগশয্যার প্রলাপ' গ্রন্থটিতে বাঙালি জীবনের নানা দিক কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সে বিষয়ে আলোকপাত করা। আমরা বুঝতে পারবো ক্রমশ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে বাংলার তথা বাঙালি জীবনকে পর্যবেক্ষণ করেন। পাশাপাশি সেকাল ও একালের অবস্থানগত তুলনামূলকতার ভিত্তিতে স্পষ্টভাবে ধরতে চেয়েছেন তৎকালীন মানুষের জীবনযাপনের পরিবর্তন ও তার প্রবাহমানতাকে।

ব্যোমকেশ মুস্তফীর রোগশয্যার আলোচনা দিয়ে শুরু হয় গ্রন্থের সূত্রপাত। রোগে আক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী দিনযাপনের চিত্র সেদিনের মধ্যবিত্ত ঘরে কেমন হতে পারে এবং গৃহকর্তাকে কেন্দ্র করে বাঁচা পরিবার জীবনের কথা জানা যায়। পরিবারে দারিদ্র্য তো ছিলই, রোগগ্রস্ত হয়ে তা আরো প্রকট হয়ে ওঠে। জীবনে দারিদ্র্য থাকলেও তা যে মনকে পীড়িত করে না, বোঝা যায় যখন দেখি তিনি অনুভূতির সরসতায় জ্বরবিকারের 'আগম-নিগম' নিয়ে কথা বলেন -

> "আজ ছয় মাস এইভাবে জ্বরের সঙ্গে একাত্মভাবে। ঘরকন্না করিতেছি, ...।"[১]

সরস ভাষায় এমন উপলব্ধি একজন কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। এরূপ মানসিকতায় রোগশয্যা তাঁর কাছে পরিণত হয়েছে 'সুখশয্যায়'। তাই গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধের শুরুতে তিনি বলেন -

> "এই রোগশয্যার সুখশয্যায় পড়িয়া মনটাও কত উদ্ভট কল্পনা লইয়া ব্যস্ত হয়।"[২]

স্বাভাবিকভাবে রোগগ্রস্ত অবস্থায় ব্যোমকেশ মুস্তফীর দিনকাটে চিকিৎসক তথা বৈদ্যদের পরামর্শে। বাংলায় এই বৈদ্যজাতির সামাজিক আবির্ভাব সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেন। তাঁর সচেতন মানসিকতায় ধরা পড়ে, প্রাচীনকালের আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা সময়ের বিবর্তনে ও বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক রাজত্বে কেমন ছিল। আমরা দেখব ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময়ে নানান জাতির আগমন ঘটে সাম্রাজ্য বিস্তার ও বাণিজ্যিক কারণে। যারা এদেশে থেকে যায়, তারা বৈবাহিক পরিণয় সূত্রে সন্তানের জন্ম দেয়। এভাবে বর্ণসাঙ্কর্য্যের ফলে বিভিন্ন জাতি তৈরি হতে দেখা যায় বাংলায়। তাই এরকমই এক জাতি বৈদ্যদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক তার দ্বিতীয় প্রবন্ধে বলেন -

> "বৈদ্যরা কে? ভারতের কোথাও বৈদ্য নাই। কেবল বাঙ্গালাই দাশগুপ্ত, করগুপ্ত, ধরগুপ্ত, নন্দীগুপ্ত প্রভৃতিতে ভরা; বর্ণসাঙ্কর্য্যের ফলে যত জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, বাঙ্গালা দেশ ভিন্ন আর কোথাও বৈদ্যজাতির অস্তিত্ব নাই। এমনটা কেন? অন্যত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও কায়স্থই আয়ুর্ব্বেদ ব্যাবসায়ী।"[৩]

ইংরেজ রাজত্বের অনেক আগে প্রাগাধুনিক সময়ে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের বেতন ছিল না। কারোর দ্বারা ব্যক্তির রোগমুক্তি ঘটলে পুরস্কার ও প্রণামী দানের রীতি ছিল। অতীতে হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজত্বে ঔষধি বা চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে প্রাবন্ধিক বলেন –

> "...হিন্দুর আমলে বেদাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ দ্বিজাধিকারে ছিল। তারপর বৌদ্ধাধিকারে যতি-শ্রমণ-ভিক্ষুরা যখন আতুরের সেবা, রোগীর সেবা, অনাথের সেবার ভার গ্রহণ করিল, বিহারে পীড়িত পশুপক্ষী ও মানবের শশ্রুষাগার স্থাপিত হইল, রোগ-পরিচর্য্যা, আর্ত্ত-পরিত্রাণ যখন যতিধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইল, তখন গৃহস্থ ব্রাহ্মণাদি আয়ুর্ব্বেদ ত্যাগ করিবার অবসর পাইলেন। গৃহীর দুঃসাধ্য কতকগুলা বহুফলপ্রদ ধাতুঘটিত তন্ত্রোক্ত ঔষধ এই সময়ের এই সকল যতি-শ্রমণ-ভিক্ষুরা প্রস্তুত করিয়া দুরারোগ্য রোগে ঐন্দ্রজালিকের ক্রিয়া দেখাইতে লাগিলেন। আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ, তন্ত্রোক্ত মন্ত্র-চিকিৎসা ও ঔষধ-চিকিৎসায় পারদর্শী যতি-সন্ন্যাসীর আদর এই সময়ে বহুরোগের আকর বঙ্গদেশের গৃহস্থগণের নিকট সাতিশয় বাড়িয়া গেল। অশোকাদি রাজগণের ব্যবস্থায় রাজব্যয়ে সকলকে ঔষধ বিতরিত হইত। সেবা শুস্রূষা ও ঔষধের মূল্য লওয়া যতি-ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ অন্যায় কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত, কাজেই ক্রমশ পুর্ব্বকালের খরচ দিয়া ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া দ্বিজ চিকিৎসক দেখান বন্ধ হইয়া গেল। সন্ন্যাসী চিকিৎসকের আদর গৃহদেবতারও অধিক হইয়া উঠিল।"[৪]

পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্মের পরাজয়ে শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত চুরাশি হাজার বৌদ্ধ বিনাশ করিলেন। এইসময় কিন্তু হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রজারা পরস্পর প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে সমাজের এসব যতি চিকিৎসকদের প্রাণ রক্ষার্থে এগিয়ে আসে। ফলত দেখা যায় –

"বৌদ্ধ বিপ্লবে অনেক নূতন জাতির সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। পরে ক্রমশঃ বৌদ্ধ শব্দ হইতে বৌধ বৈদ নাম হইল-শেষে আবার তাহাকে অলঙ্কৃত করিয়া 'বৈদ' করা হইল। তাহার পরে বৈদ মহাশয়েরা দেববৈদ্য দেবশ্রেষ্ঠ ধন্বন্তরি প্রভৃতিকে ধরিয়া আপনাদের গোত্র স্থির করিলেন।"[৫]

এইভাবে পৌরাণিক শক্তি, অত্রি, পরাশর প্রভৃতি মুনিঋষিদের গোত্র গ্রহণ করে আয়ুর্ব্বেদীয় অধিকার পায় পরবর্তী সময়ের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা এবং তাদের মাধ্যমে ইতিহাসের বিভিন্ন সময়পর্বে এই বৈদ্য চিকিৎসার অগ্রগতি লক্ষ করা যায়। প্রাবন্ধিক ব্যোমকেশ মুস্তফী নিজের রোগশয্যার সূত্রে আপামর বাঙালির স্বাস্থহানি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তৃতীয় প্রবন্ধে। বাঙালির জীবনধারায় কিছু নিজস্ব নিয়ম পদ্ধতি চালু ছিল। পরবর্তীতে বিদেশি সভ্যতার সংস্পর্শে এসে বাঙালির দেশোচিত নিয়মে পরিবর্তন আসে। বাঙালির নিজস্ব সিস্টেম সম্পর্কে প্রাবন্ধিক বলেন -

"দেশে নিয়ম ছিল-প্রাতঃস্নান, প্রাতর্ভ্রমণ, ফুলতোলা, সন্ধ্যাহ্নিক জন্য 'দেবালয় ও নদ্যাদিতে গমন; পরে বিষয়-কার্য্য; পরে মধ্যাহ্নে বাড়ী আসিয়া মধ্যাহ্ন-স্নান, মধ্যাহ্ন-ভোজন, মধ্যাহ্নে বিশ্রাম; পরে বৈকালিক বিষয়-কর্ম্ম; তৎপরে সূর্য্যাস্তের পর আবার সন্ধ্যায় পূজা, দেবদর্শনাদি উপলক্ষে ভ্রমণাদি স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা।"[৬]

বিশেষত ইংরেজ রাজত্বে মানুষের সব কাজকর্মের সময় নির্ধারিত হয় মধ্যাহ্নকাল। তাই অফিস, আদালত, কুঠি, দোকান, বাজার, বন্দর প্রভৃতি স্থানে কাজকর্ম এই সময় করা হয়ে থাকে। ফলে বিদেশি আদব কায়দায় চলতে গিয়ে বাঙালিরা অজীর্ণ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, ওলাউঠা প্রভৃতি নানান রোগের শিকার হয়। প্রাবন্ধিক রাজনারায়ণ বসুর রচিত 'সে কাল আর এ কাল' প্রবন্ধ থেকেও একই কথা জানা যায়। তিনিও বাঙালিদের 'শারীরিক বলবীর্য্য' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন -

"এক্ষণকার লোকের শারীরিক বল-বীর্য্য হ্রাসের আর এক কারণ অতিশয় পরিশ্রম ও অকালে পরিশ্রম। এতদ্দেশে ইংরাজী সভ্যতা প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিশ্রম অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। ইংরেজেরা যেরূপ পরিশ্রম করিতে পারেন, আমরা সেরূপ কখনই পারি না। কিন্তু ইংরেজেরা চাহেন যে, আমরা তাঁহাদের ন্যায় পরিশ্রম করি। ইংরাজী পরিশ্রম এ দেশের উপযুক্ত নহে। ...এখনকার রাজপুরুষেরা যে দশটা হইতে চারিটা পর্যন্ত কর্ম্ম করিবার নিয়ম করিয়াছেন, ইহা এ দেশের পক্ষে কোনরূপে উপযোগী নহে।"[৭]

তাই বাঙালিদের জীবনে স্বাস্থ্য অবনতির কারণ সম্পর্কে বলা যায় পাশ্চাত্য প্রভাব দারুণভাবে বলবৎ হয়েছে। যা সাহিত্যিক রাজনারায়ণ বসুও একবাক্যে স্বীকার করেন তাঁর 'সে কাল আর এ কাল' প্রবন্ধে -

"শরীর সম্বন্ধীয় ইংরেজি আচার ব্যবহার অবলম্বন শারীরিক বলবীর্য হানির এক প্রধান কারণ।"[৮]

বাঙালির জীবনযাপন প্রণালী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিশেষত গ্রামজীবনের কথা বলেছেন। ভারতবর্ষের এক সনাতন প্রথার রূপ ধরা পড়ে যৌথ পরিবার ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে। একই যৌথ পরিবার ভিত্তিক জীবন যাপন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দৃঢ় প্রোথিত ছিল বাংলার গ্রামজীবনে। সময় ও শিক্ষার অগ্রগতি মানুষের একসময়ের প্রচলিত জীবনবোধে পরিবর্তন আনে। লেখাপড়া শিখে গ্রামের মানুষ ডাক্তার, উকিল, অধ্যাপক, কেরানি প্রভৃতি পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়ে শহরে চলে যায়। কারণ তাদের গ্রামে থেকে এসব কাজ করে অন্ন সংস্থানের তেমন উপায় হয় না। আর গ্রাম্য পথঘাটের দুর্গমতা পেরিয়ে বাসস্থান ও কর্মস্থানের মধ্যে নিত্য যোগাযোগ বজায় রাখা প্রায়শই সম্ভব হত না। ফলে তারা স্ত্রী পরিবার নিয়ে শহরমুখী হতে থাকে। এভাবে একান্নবর্তী পরিবার জীবনে ভাঙন ধরে। জন্মভূমির টান ও আত্মীয় স্বজনদের টান তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে একই পরিবার মধ্যে ধরে রাখতে পারে না। পূর্বেকার গ্রামজীবনে বসবাসরত বা অবস্থানকারী কোন কোন ব্যক্তি সামাজিক ক্ষেত্রে আর পাঁচটা ব্যক্তির দ্বারা মান-সম্ভম-পতিপত্তি লাভ করতেন। দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে তাও কমে যায়। তাই সবমিলিয়ে সেকালের গ্রামজীবনের কথা প্রাবন্ধিকদের স্মৃতিতে ধরা পড়ে এভাবে -

"তখনকার পল্লীবাসে যশঃ, মান, সম্ভম ও পতিপত্তি লাভের উপায় স্বতন্ত্র ছিল, কাজেই ভাগ্যবান ব্যক্তি যশঃকামী হইয়া সেই সকল উপায় অবলম্বন করিয়া গ্রামে সম্ভমশালী হইতেন। তাঁহাকে দেশে পূজাদি উৎসব, পুস্করিণী, দেবমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শনাদি কালে গ্রামের দশজনকে সঙ্গে লওয়া ইত্যাদি কার্য্য

> করিতে হইত। ...এইরূপে ভাগ্যবানের অর্থে যেমন পাঁচজন আত্মীয় স্বজন প্রতিপালিত হইতেন, তেমনই প্রতিপালিতেরাও তজ্জন্য পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি রক্ষায়, চাষ-আবাদ পরিদর্শনে, দৈব ও পৈত্রা কার্য্যের অনুষ্ঠানে, বালক বালিকার শিক্ষা প্রভৃতি গৃহকর্ম্মে, গৃহদেবতার সেবায়, শিশুপালনে, ধান চাল ঝাড়া-বাছায় আপনারা উৎসাহ পুর্ব্বক যোগ দিতেন।"[৯]

কালপ্রভাবে বিচ্ছিন্ন অবস্থানে থেকে মানুষ ক্রমশ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। আমরা দেখব পূর্বের একান্নবর্তী পরিবারভুক্ত সমাজ ব্যবস্থায় ঘনিষ্ঠ ও দুঃসম্পর্কীয় আত্মীয়রা নিজেদের মধ্যে একাত্মতা অনুভব করতেন। একজনের সুখ-দুঃখে আত্মীয়েরা প্রয়োজন মতো পাশে থাকতেন। কেবল আত্মস্বার্থ পরায়ণতা চরিতার্থ করতে ব্যস্ত থাকেনি সেদিনের মানুষ। তাই প্রাবন্ধিক বলেন -

> "সেকালের কোন খুড়ী, মাসী, জেঠাই বা জ্ঞাতি ভগিনী মনে করিতেন না, আমি আবীরা, আমার তিনকুলে কেহ নাই, তাই আজ অমুকের গলগ্রহ হইয়াছি, ইহাদের সংসারে না খাটিলে ইহারা ভাত দিবে কেন? এতটা ভেদবুদ্ধি, স্বার্থগান, অনাত্মীয়তা তখনকার সমাজে ফুটিতে পাইত না। যিনি উপার্জ্জন করিতেন, তিনিও ঐরূপই মনে করিতেন, - ইহারা আমার নিজ পিতামাতা, সন্তানসন্ততির ন্যায় অবশ্য প্রতিপাল্য; ইহাদের অপালনে আমার প্রত্যবায় ঘটিবে, নিন্দা হইবে, পালনে কোন প্রশংসা নাই।"[১০]

তৎকালীন উপার্জনক্ষম ব্যক্তি পুরুষ যেভাবে আপন মনোভাব পোষণ করতেন তেমন নারীরাও পারস্পরিক ভাবে সহৃদয়তার পরিচয় দিতেন। তাই তাদের ভাবনা-চিন্তা দেখা যেত এরকম –

> "তখন এক পরিবারভুক্ত একান্নবর্তী ঘনিষ্ঠ ও দুঃসম্পর্কীয় সকলেই মনে করিতেন- প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন, 'এটা আমাদের সংসার-'...পাঁচজনে খেলে-পরলেই আমার খাওয়া-পরার সাধ মিটবে।"[১১]

সময়ের অগ্রগতি মানুষের চিন্তাধারায় পরিবর্তন আনে। যৌথ পরিবারে আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে প্রাণের একাত্মতা অনুভব করে না। আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবে নিজ নিজ পরিবার নিয়ে ভিন্ন হয়ে যায়। ক্রমশ শহরবাসী মানুষদের পুর্বতন বাড়ির আত্মীয়দের সঙ্গে চিঠি পত্রের সূত্রে আত্মীয়তার বন্ধন কমতে থাকে। প্রবাসে গিয়ে দিন যাপনের ক্ষেত্রে অধিকাংশ কাজেই বেতনভুক ভৃত্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। এভাবেই তারা অভ্যস্ত হয়ে যায়। তাই 'পুরাতন ভৃত্য ও দুই বিঘা জমীর মায়া' আর তাদের থাকে না। অন্যদিকে গ্রাম্য পরিবেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। বিপরীতে শহর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় জনসমাগম বাড়ে। তবুও এখানে মানুষের মধ্যে একটা পারস্পরিক দুরত্ব থেকে যায়। এই প্রবাসী মানুষেরও বাড়ির আত্মীয়তার নিবিড় বন্ধন কমে যায়। আর যথার্থ সহানুভূতির অভাবে তারা প্রবাসে থেকে আন্তরিকতায় আত্মীয়তার স্বাদ পায় না। তাই দুই জায়গার জীবন যাপন সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের ভাষায় বলা যায় –

> "প্রবাসী বন্ধুরা পরস্পর সকলেই স্ব স্ব গ্রাম, আত্মীয় ভুলিয়া যান, কিন্তু একটা বিষয়ে সকলেরই চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ণ চৈতন্য জাগরিত থাকে যে, আমরা কেহ কাহারও আত্মীয় নই, আমরা কেহই কাহারও কেহ নই-কাজেই নিজ গ্রামে বাগদী জেঠা ও গয়লামাসীকে লইয়া যে আত্মীয়তার বন্ধন পুরুষপরম্পরাক্রমে বাঁধা থাকে, নববাসস্থানে তেমন বাঁধন আর বাঁধা যায় না।"[১২]

একান্নবর্তী পরিবার প্রথায় বিভিন্ন কারণে ভাঙন ধরে। এর একটা খারাপ ফলাফল দেখা যায় বিশেষত বাড়ির প্রবীণ বিধবাদের ক্ষেত্রে। যৌথ পারিবারিক জীবন ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে প্রবীণ বিধবাদের নিরাশ্রয়তা বা দুর্দ্দশার শিকার হতে হয়। তাদের অবস্থান ও দায়িত্বের জায়গা দুর্বল হয়ে যায়। যৌথ পরিবার ভেঙে যারা প্রবাসী হয়ে যায় সেই সকল উপার্জনক্ষম প্রবাসী প্রয়োজনের তাগিদে বিধবাদের দাসী, বামনী ও পরিচারিকা করে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নানান কারণে তারা আপত্তি জানালে আশ্রয়হীনতার সমস্যায় পড়েন। গঙ্গা তীরবর্তী গ্রামবাসীরা আপত্তি জানায় যে শেষ দশায় গঙ্গা স্নানের পুণ্য থেকে বঞ্চিত হতে চান না। আবার প্রবাসে পদোচিত মর্যাদা রক্ষার্থে নিজের পারিবারিক খরচ বাড়তে থাকলে দেশের বাড়িতে পাঠানো টাকার পরিমাণ কমে যায়। এদিক থেকেও বিধবারা অন্ন-বস্ত্রের সমস্যায় পড়েন। এরকম বেশ কিছু বাস্তবিক ঘটনাবলীর জন্য প্রাবন্ধিক বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী ও কর্তব্য বুদ্ধির পরিবর্তন

হওয়াকে দায়ী করেছেন। কেননা সেকালের শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমশ স্বাবলম্বন ও আত্মতৃপ্তির চেষ্টা করতে শিক্ষা দেয়। যা পূর্বের শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থায় ছিল না। তা প্রাবন্ধিকের ভাষা দিয়ে বলা যায় –

> "ফলকথা, বর্ত্তমান শিক্ষা প্রাণালী ও কর্তব্য বুদ্ধির পরিবর্তন হওয়াতে আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা উলটাইয়া যাইতেছে... কিন্তু এমনভাবে স্বাবলম্বন ও আত্মতৃপ্তির চেষ্টা করিতে শিক্ষা দেয় যে, তাহাতে অন্যদিকে চাহিবার অবসর ও সুযোগ হয় না।"[১৩]

অন্যদিকে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক উনিশ শতকের সৃষ্ট কেরানির ছেলেদের শিক্ষাপ্রাপ্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সেই সঙ্গে দেশের অতীত ও বর্তমানের শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। অতীতের দিকে তাকালে দেখা যায় সেকালের গ্রাম সমাজে পন্ডিত বা গুরুমশায়েরা ছাত্রদের থেকে বেতন নিতেন না, তারা গ্রামীণ জমিদারের থেকে পাওয়া দান-দক্ষিণায় জীবন চালাতেন। আর পারিবারিক ধারা অনুযায়ী সাধারণ গৃহস্থ সন্তানেরা তাদের কাছে 'অর্থকরী বিদ্যায়' জ্ঞানলাভ করে জমিদারদের কাজকর্মে চাকরি নিয়ে জীবন যাত্রা নির্বাহ করতেন। অপরদিকে উচ্চশিক্ষার সুযোগ থাকলেও পারিবারিক ব্যবস্থানুযায়ী শিক্ষা গ্রহণের সম্ভাবনা যাদের থাকত তারাই করতে পারতো। সকলকে উচ্চ শিক্ষিত করার প্রয়োজন বা চাহিদা থাকেনি। যদিও সময়ের অগ্রগতিতে দেখা যাবে যে সকলেই এখন ছেলেদের উচ্চ শিক্ষিত করতে চায়। তাই প্রাবন্ধিক তার ষষ্ঠ প্রবন্ধে বলেন -

> "এখন সে ব্যবস্থা নাই, - এখন সকলেই ছেলেকে আপনার ক্ষমতার অতিরিক্ত উচ্চশিক্ষা দিবার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া ছেলের বর্ণপরিচয়কাল হইতে বিপথে চালিত করে।"[১৪]

প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী তার 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' বইতে 'বই পড়া' প্রবন্ধেও একই কথা বলেছেন বর্তমান শিক্ষা প্রসঙ্গে -

> "আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষার পদ্ধতি ঠিক উলটো। সেখানে ছেলেদের বিদ্দে গেলানো হয়, তারা তা জীর্ণ করতে পারুক আর নাই পারুক। এর ফলে ছেলেরা শারীরিক ও মানসিক মন্দাগ্নিতে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসে।"[১৫]

শিক্ষাকে সম্পদের মতো ব্যবহার করা হয় না। তাই শিক্ষার ফল সর্বদা হিতকর হয় না। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষা সম্পর্কিত আলোচনায় শিক্ষার গতিপ্রকৃতি নিয়ে কথা বলেন। পারিবারিক সাম্যর্থ অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষা সকলেই দিতে চায়। কিন্তু তৎকালীন ঔপনিবেশিক আমলে সৃষ্ট কেরানিরা স্বল্প বেতনের চাকুরীজীবি হওয়ায় ছেলেদের উচ্চ শিক্ষায় বেশি ব্যয় করতে পারতেন না। তাই তাদের পুত্রদের শিক্ষা ঠিক মতো হয় না।

ভারত ইংরেজদের হাতে পরাধীন থাকে প্রায় দুশো বছর। ইংরেজরা ভারতে তাদের নিজস্ব প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক স্তরের বিভিন্ন পেশায় যথেষ্ট সংখ্যক কর্মচারী নিযুক্ত করে। আলোচক সুমিত চক্রবর্তীর 'উনিশ শতকের কেরানিকথা' বই থেকে জানা যায় যে, এদের বেতন অল্প, পরিশ্রম অধিক আর জীবনটা ছিল ব্রিটিশ রাজশক্তি কতৃক নিয়মের নিয়ন্ত্রণাধীন। এভাবে শহরের বুকে বা শহর সংলগ্ন জায়গায় জীবন-জীবিকার সংস্থান করে নিতেন, তারাই পরিচিত হন কেরানি হিসেবে। সুমিত চক্রবর্তীর 'উনিশ শতকের কেরানিকথা' বই থেকে একজন কেরানি সম্পর্কে বলা যায় –

> "নিম্ন আয় তাঁকে সারাটা জীবন তাড়িয়ে বেরিয়েছে। আর নিম্ন আয়ের সঙ্গে সমাজ চিরকালই নিম্ন মেধার একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক কল্পনা করে নেয়, তাই কেরানিও সমাজের চোখে রয়ে গেলেন হাসির আর করুণার পাত্র হয়ে - ছা-পোষা কেরানি বা মাছি-মারা কেরানি হিসেবে।"[১৬]

ইংরেজদের হাত ধরে এদেশে চালু হয়ে যায় 'দশটা-পাঁচটা চাকরির ধারণা' বা 'অফিসকেন্দ্রিক চাকরির সংস্কৃতি'। প্রথমে কেরানিরা এ নিয়মের শিকার হয়। ভারতের পরাধীনতায় ইংরেজ রাজত্বের নিয়ম নীতি দেশীয় নিয়মের পরিবর্তন ঘটায়। এর প্রসঙ্গ আমরা পেয়েছি বাঙালির স্বাস্থ্যহানির কারণ ও ফলাফল নিয়ে আলোচিত প্রবন্ধে। সেখানেও একইভাবে কারণের জায়গায় বৃটিশ নিয়ম নীতির কথা বলা হয়েছে। ফলত এসব কেরানিদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য-অবনতি দেখা যায় এবং নানা দিকে দুর্দ্দশায় ভোগে তারা। আলোচক প্রজিত বিহারী মুখার্জির ভাষায় বলা যায় এভাবে -

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 70
Website: https://tirj.org.in, Page No. 597 - 607
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "প্রজিত বলছেন, একাধারে মুখস্থ বিদ্যা-নির্ভর লেখাপড়ার চাপ, তারপর কেরানির দুর্বিষহ চাকরি, এবং উনিশ শতকের শহর কলকাতার দূষিত জল সরবরাহ- এইসব কারণে কেরানিকুল সর্বদাই ভুগতেন বিভিন্ন রোগে।"[১৭]

প্রাবন্ধিক ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় একজন কেরানির দিনযাপনের খুটিনাটি চিত্র তুলে ধরে শহরের চাকুরীজীবিদের অবস্থানকে দেখাতে চেয়েছেন।

সেকালে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল এরকম যে শাস্ত্র শিক্ষা, চিকিৎসা বিদ্যা-শিক্ষা করতে ছাত্রদের পন্ডিত অধ্যাপকদের বাড়িতে গিয়ে থাকতে হত। ধীরে ধীরে উচ্চ শিক্ষা বিক্রিত পণ্যস্বরুপ হয়ে যায় সকলের কাছে। যার প্রভাব সামাজের পক্ষে লাভজনক হয়নি। তাই প্রাবন্ধিক তার ষষ্ঠ প্রবন্ধে বলেন –

> "উচ্চশিক্ষার ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া আচন্ডালে বিদ্যালাভের সুবিধা করা হইয়াছে। ...কিন্তু যুবকবৃন্দের উপার্জ্জনের কোন শিক্ষা হইতেছে না।"[১৮]

সুতরাং দেখা যায় শিক্ষার উন্নতি ঘটলেও দেশীয় বাঙালি যুবকদের উন্নতি তেমন লক্ষণীয় হয় না। বাঙালির কাজকর্মের ক্ষেত্রে আমরা তা দেখতে পাই। এই সুত্র ধরে দেখে নেওয়া যাক এদেশের বাঙালির শিক্ষাপ্রাপ্তি ও কাজকর্ম কীরূপ প্রকৃতির।

বাঙালি সমাজে চিরকাল শীর্ষস্থানে ছিল জমিদার শ্রেণি। তারাই সেকালে গুরুমশাই রাখতেন গ্রামের গৃহস্থ বাড়ির ছেলেদের শিক্ষাদানের জন্য। পন্ডিতের পাঠশালায় শিক্ষিত সাধারণ গৃহস্থ বাড়ির যুবকরা জমিদারিতে চাকরি নিয়ে দেশীয় কাজকর্ম করত। তাদের কাজ করার যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু বিদেশি শাসন ও শিক্ষার প্রভাবে সে স্বাধীনতা আর থাকে না। ইংরেজরা প্রশাসনিক স্তরে দেশীয় নিয়মে পরিবর্তন আনে। ক্ষমতা তাদের হাতে চলে যাওয়ায় তাদের ইচ্ছেমতো কাজকর্ম চলতে থাকে। এদিকে বাংলার জমিদাররা ধীরে ধীরে করসংগ্রহী ও আত্মবিলাসী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে দেশের লোকজন শিক্ষিত হতে শুরু করলে সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের ভুমিকা কমে আসে। তাই প্রাবন্ধিক তার নবম প্রবন্ধে বলেন –

> "প্রজারক্ষার ব্যবস্থায়ও আর তাঁহাদের হাত দিবার প্রয়োজন নাই, - কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধানের জন্য গভর্মেন্টের কৃষি-বিভাগ আছে, পূর্ত্ত-বিভাগ আছে, আপদ-বিপদ-রক্ষার্থ পুলিশ আছে, বন-বিভাগ আছে; ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য বাণিজ্য-বিভাগ আছে। ...ঐ সকল বিষয়ে ঐ সকল বিভাগ দ্বারা দেশের সর্ব্বত্র এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় যে, জমীদারদিগের স্বাধীনভাবে কোন-কিছু করিবার পক্ষে বিশেষ বাধা ও অনুৎসাহ জন্মে।"[১৯]

সামাজিক বর্ণ বিভাজনের উচ্চে থাকে ব্রাহ্মণরা। বাঙালির কাজকর্মের কথা বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রসঙ্গ এনেছেন। ব্রাহ্মণ্য শাসনের নির্ধারিত বৃত্তিবিধান ক্রমশ লোপ পেতে থাকে। যজন-যাজন, অধ্যাপনা বৃত্তিতে বংশ পরম্পরায় তাদের উত্তরাধিকারী মানুষজন ভালোভাবে নিজেদের জীবিকা উপার্জন করতে না পারলে, উক্ত বৃত্তি ত্যাগ করে 'শ্ব-বৃত্তির' জন্য শিক্ষিত হতে থাকে। তাই প্রাবন্ধিক বলেন নবম প্রবন্ধে -

> "পূর্ব্বদত্ত বৃত্তি এখনকার কালে উত্তরাধিকার সুত্রে বহুধা বিভক্ত হওয়ায়, সেই সকল ব্রাহ্মণ বংশ আর স্ব-বৃত্তিতে নির্ভর করিয়া থাকিতে না পারিয়া শ্ব-বৃত্তির অনুসরণে বাধ্য হইয়াছেন।"[২০]

পূর্বের সমাজ ব্যবস্থায় দেশীয় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ব্যতীত অন্য সব জাতির জাতিগত বৃত্তি নির্দিষ্ট ছিল। যার মাধ্যমে তারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতিতে যুগের উপযোগী 'পরমার্থ-শ্ব-বৃত্তি' শিক্ষার ব্যবস্থা আর হচ্ছে না।

কারণস্বরূপ লেখক বাঙালি মানুষদের জাতিগত বৃত্তি পরিবর্তনের জন্য পাশ্চাত্য প্রভাব ও বাঙালির অনুকরণ শীলতার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। প্রাবন্ধিকের ভাষা দিয়ে বলা যায় -

> "বাঙ্গালীর জাতিগত বৃত্তি-উপার্জ্জন-ব্যবস্থা কতক খাইয়াছে - ইংরেজ-অনুকরণে স্বাবলম্বনের স্বর্ণমোহে; আর কতক খাইয়াছে -বিদেশী বণিকের ব্যবসা বাণিজ্যে।"[২১]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 70
Website: https://tirj.org.in, Page No. 597 - 607
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আবার দেশীয় সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তিবিধানকর শিক্ষার সুযোগ যেমন হয় না, তেমনি পেশাগত শিক্ষাক্ষেত্রে যথা চিকিৎসা, ওকালতী, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতিতে পাশ দিয়েও কর্মসংস্থানের অভাব দেখা যায়। পাশাপাশি দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় যথা জমিদারী, কেরানি, ছাপাখানা, রেলওয়ে প্রভৃতিতে প্রচুর লোক পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত বৃত্তিবিধানকারী শিক্ষার অভাব থেকে যায়। তাই প্রাবন্ধিক তার নবম প্রবন্ধে শিক্ষা সম্পর্কে বলেন -

"শিক্ষা দাও, কিন্তু এমন করিয়া শিক্ষা দাও যাহাতে দেশের বৃত্তিবিধান হয়।"[২২]

উপরোক্ত সূত্রধরে শিক্ষা বিষয়ক আরেকটি দিক দেখে নেওয়া যাক, সেটি হচ্ছে বিদেশি শিক্ষাগ্রহণে এদেশের মানুষ কীভাবে উন্নতি করতে পারে। পেশাগত শিক্ষা যেমন ওকালতি, চিকিৎসা প্রভৃতি বিদেশে শিক্ষাগ্রহণের পর দেশে ফিরে এলে কর্মসংস্থান করে নিতে পারবে। কিন্তু কৃষি জাতীয় একাধিক ব্যবসায়িক শিক্ষাগ্রহণ দেশীয় ক্ষেত্রে তেমন ফলদায়ী হয় না। সে সময় বিদেশি শাসকের রাজত্বে দেশীয় ব্যবসাবাণিজ্য পরহস্তগত। আর 'স্বজাতি প্রতিপালক' হওয়ায় তারাও নিজের দেশের মানুষের কথা ভাবে। ব্যবসায়ীর উপযুক্ত 'ব্যয়-হ্রাস নীতি'র কথা না ভেবে স্বজাতীয় ব্যক্তিদের অধিক বেতনে নিযুক্ত করত। ফলস্বরূপ স্বদেশে যুবকদের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দান ও অন্নসংস্থানের কোন উপায় থাকে না।

বিদেশ গিয়ে যারা কৃষিবিদ্যা রপ্ত করে দেশে ফিরে আসেন, দেশীয় জমিদারগণ তাদেরকে কাজে নিযুক্ত করতে পারেন। তাদের শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে অর্থাৎ শিক্ষার সঠিক প্রয়োগ ঘটিয়ে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি, একই জমিতে একাধিক শস্যচাষ, ফসলের গুণমান বৃদ্ধি করা, নতুন ধরনের আয়কর ফসলের উৎপাদন করা প্রভৃতি সম্ভব হয়। এভাবে দশ ও দেশের উন্নতি ঘটানো যায়। কিন্তু বাস্তবে এ সমস্ত কৃষিশিক্ষা সম্পন্ন যুবকদের প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার না করে বর্তমানে জমিদারগণ কেবলই আত্মবিলাসী হয়ে খাজনা আদায় করার কাজে নায়েব, গোমস্তা, পাইক, বরকন্দাজ প্রভৃতি নিয়াগ করে। প্রজাপালনের জন্য তেমন কোন কিছু করতে দেখা যায় না। যদিও প্রজাহিতার্থে কৃষি জমির উন্নতিতে সাহায্য করাই প্রত্যেক জমিদারের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত। এতে প্রজা রক্ষা ও আত্মরক্ষা উভয়ই সম্ভব হয়। অনুরূপ একই বিষয় পূর্ববর্তী নবম প্রবন্ধে পেয়েছি।

অন্যদিকে ব্যবসায়িক কাজকর্ম যেমন চিনি, সাবান, দেশলাই, কাচ, লৌহ, খনি প্রভৃতি উৎপাদন মুলক কাজ যারা শেখে তারাও কর্মসংস্থানের দুর্দ্দশায় পড়ে যায়। দেশীয় কোন কলকারখানা না থাকায় তাদের কোনরূপ কর্মক্ষেত্র তৈরি হয় না। আর দেশীয় ব্যবসাদার থাকলেও তারা দেশের মানুষের কাছে ভয়াবহ স্বরূপকে প্রকাশ করে। তাই প্রাবন্ধিক তার পঞ্চদশ প্রবন্ধে বলেন তাদের সম্পর্কে -

"আমাদের দেশীয় ব্যবসাদার যাঁহারা আছেন তাঁহারা বড় বড় দোকানদার, আড়তদার মাত্র। বিদেশী মালের আমদানি করিবার স্বাধীনতা তাঁহাদের আছে, কিন্তু, স্বদেশী মালের রপ্তানিতে তাঁহাদের স্বাধীনতা নাই, সুতরাং ঘরের টাকা দিয়া পরের লাভ ঘটাইতে তাঁহারা পারেন; কিন্তু ঘরের মাল বেচিয়া বিদেশের টাকা ঘরে আনিতে তাঁহারা পারেন নাই।"[২৩]

তাই বলা যায় বাণিজ্য ক্ষেত্রের এমন সঙ্কীর্ণতার জন্য এই সকল বিদেশি শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের কর্মক্ষেত্র তৈরি হয় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ব্যবসা বাণিজ্যের সূত্রে আসে কলকারখানা তৈরির কথা। সমকালীন সময় প্রবাহে এককভাবে কলকারখানা চালানো সম্ভব ছিল না। তবু যৌথ প্রয়াসেও কলকারখানা পরিচালনার মনোভাব ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে দেখা যায়নি। তাই যৌথ কারবারের চেষ্টা আমাদের দেশে স্থায়ী হতে পারেনি -

"এখানে যদি একা দ্বারা বহুমূল্য কলকারখানা করা সম্ভব না হয়, তবে যৌথ-মূলধনে তাহা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু এদেশে এরূপ যৌথ কারবারের অভিজ্ঞতা নাই, এরূপ কারবার পরিচালনের শক্তিও এদেশে নাই।"[২৪]

তাই প্রাবন্ধিকের অভিমত অনুযায়ী বলা যায় যে শুধু যুবকদের শিক্ষিত করলে হবে না। সেই সঙ্গে এ সমস্ত যুবকদের কাজে সহায়তা প্রদানকারী লোকজনকেও প্রশিক্ষণ নিতে হবে। এভাবেই স্বদেশে যুবকদের প্রকৃত কর্মক্ষেত্র গড়ে উঠবে এবং দেশের মানুষ উপকৃত হতে পারবে বলা যায়।

আমরা শিক্ষাপ্রসারের সূত্রে দেখেছি পরিবার-সমাজে বিধবা নারীদের অবস্থান। এবারে দেখে নেওয়া যাক বাঙালি সমাজের কন্যাদানের রীতি-প্রকৃতির স্বরূপ। 'বাঙ্গালীর কন্যাদায়' বিড়ম্বনা প্রচলিত একটি সামাজিক সমস্যা। সমাজের বিবিধ জাতিগত স্তরে বৈবাহিক ক্ষেত্রে সামাজিক মানদন্ডের প্রকৃতি সম্পর্কে জানা যায়। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী সকল পিতাই কন্যার পাত্র নির্বাচনে সর্বগুণসম্পন্ন রূপ, বিদ্যা, অর্থ, কুলমান ও দাতা-ভোক্তা পাত্রের চেষ্টা করতে থাকেন। প্রাবন্ধিক এখানে মূলত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-কায়স্থ সমাজের কথা বললেও কন্যা বিবাহের এমন ধরন-ধারণ সমাজের সকল স্তরের ক্ষেত্রে একরকম চিরন্তন সত্য ঘটনা।

সমাজের সকল প্রকার মানুষের কাছে অর্থ সর্বাপেক্ষা প্রার্থনীয় বস্তু। সেইসঙ্গে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে বেশি করে অর্থদৈবত করে তোলে। আর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিদ্যার ওজনে পাত্রের গুরুত্ব পরিমাপ করা হয়। সামাজিকভাবে বৈবাহিক বিষয়ে বাংলায় পাত্রের মূল্যমান সম্পর্কে প্রাবন্ধিক বলছেন –

> "আজ-কাল আমরা যে পাত্রের বিদ্যার পরিমাণ জানিতে চাই, তাহার মুখ্যার্থ তদ্বলে পাত্র ভবিষ্যতে কি পরিমাণ অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবে, তাহারই কুৎ করিয়া লইয়া পাত্রের দর ঠিক করি, এই ভাবের অনুসারে বড়মানুষের ঘরের রূপ-গুণ-বিদ্যাহীন পাত্রও জ্বলন্ত আগ্রহের সহিত গৃহীত হয়। তাহার পরেই এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার ওজনে আগ্রহ ও দরের ব্যবস্থা হয়। যাঁহারা বরের বাজারের চড়া দর দিয়া উচ্চ-শিক্ষার ছাপ-মারা পাত্র বা ধনীর সন্তানকে জামাতৃত্বে বরণ করিতে পারেন না, তাঁহারা চাকুরীজীবী অথবা অন্য প্রকারে 'রোজগারে ছেলের' বাজারে ঘুরিতে বাধ্য হন। সেখানেও দর বড় কম নহে। এখন জমীদার ও অর্থশালীর সন্তানেরাই কুলচূড়া, বিশ্বাবিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার মার্কামারা ছেলেরাই কুলীন এবং 'রোজগেরে ছেলেরা' ভঙ্গকুলীন, আর ব্যবসাদারের কাজের লায়েক ছেলেরা শ্রোত্রিয় বলিয়া গণ্য হইতেছে।"[২৫]

এবার দেখবো বিবাহ ক্ষেত্রে সামাজিক বিবিধ স্তরভেদে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে কেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়। বৈবাহিক রীতিতে দেখা যায় পঞ্চশ্রৌত জ্ঞান সম্পন্ন কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বংশধরদের কন্যা দিতে আগ্রহী হয় দেশীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা। পরবর্তীতে সেন আমলে বল্লাল সেনের রাজত্বকালে কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত হলে সমাজে পাত্র-বিভ্রাট দেখা দেয়। ফলে কান্যকুব্জীয় পাত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং তারাও ধনীর কন্যা গ্রহণ করতে থাকে। এভাবে সমাজে গরীব ও বংশজ পাত্রীর অভাব দেখা দেয়। এরকম ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল যে কুলীনেরা বংশজ ও কষ্টশ্রোত্রিয়ের কন্যাগ্রহণে কুলভ্রষ্ট হত। আর শ্রোত্রিয়েরা কুলীন পাত্রে কন্যাদান করলে সম্মানিত হতেন। অন্যদিকে বংশজ ও কষ্টশ্রোত্রিয়রা অর্থদ্বারা কুলীনের কুলভঙ্গ করে সম্মান কিনতেন। এভাবে তারা তাদের কন্যা, অর্থ, বিত্ত লাভ করতেন। আবার বংশজরা অর্থলোভে কন্যাদান না করে কন্যাবিক্রয়ী হয়ে উঠলে তাদের কন্যাপণ ও কুলীনের কুলনাশক বিবাহে সৎকুলীনে কন্যাদানের ক্ষেত্রে পাত্রাভাব দেখা দেয়। অন্যদিকে এ সময়ে রাজবিধিমতে শাস্ত্রানুযায়ী অরজস্কা কন্যাদান বন্ধ হলে অবিবাহিতা অধিক বয়স্কা কুলীন কুমারীর সংখ্যা বাড়ে। এ অবস্থা মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জন্মের কিছুসময় আগেও ছিল বলে জানা যায়।

কৌলীন্য বিধিমতে কুলীন পাত্র শ্রোত্রিয়ের পক্ষে দুর্লভ ছিল না বরং বংশজদের অপ্রাপ্য ছিল। সমাজে বংশজ ও কষ্টশ্রোত্রিয়রা অর্থ বলে কুলীনের কুলভঙ্গ করতে না পারলে বিবাহ দিত ভঙ্গকুলীনের সঙ্গে, এতে তাদের অর্থব্যয় কিছু কম হতো। এসময় বিদ্যা-ব্রাহ্মণের খ্যাতি কুলীন ও বংশজ সমাজ থেকে লুপ্ত হলে কুলগৌরবকে মূলধন করে ভঙ্গকুলীনগণ স্বকৃতভঙ্গ ও তার চারপুরুষ ধরে নিজেদের কৌলীন্যের দাবি রেখে বৈবাহিক বিষয় চালিয়ে যেতে থাকে। এভাবে প্রায় সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত চলত বলে জানা যায়। আবার তাদের নিজ বংশের কন্যাদানের অন্তরায় ঘটলে তারাও নিজদের অনুরূপ বংশজ ও কষ্টশ্রোত্রিয় পাত্রে কন্যাবিক্রয় করতে থাকেন। ফলে এদিকেও কন্যাপণ দিয়ে বিবাহ ব্যবসাতে মেলী কুলীন সমাজে স্বমেলের পালটী ঘরে পাত্রাভাব হতে থাকে এবং তারা মেলান্তরে বিবাহ দিয়ে কন্যাদায় থেকে মুক্ত হতে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চৈতন্যদেবের পূর্বে দেবীবর সমাজ সংস্কারের জন্য যে মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন তার সুফল কিছু সময় থাকলেও পরবর্তীতে প্রবর্তিত বল্লাল বিধির অপব্যবহারে কুলীন সমাজের একদিকে কুলনাশ, দোষাশ্রয়, কুলীন পাত্রাভাব ও বংশজদের পাত্রীভাব দেখা যায়। আবার নারীকে কেন্দ্র করে কন্যাবিক্রয়, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি ব্যবসায় পরিণত হয়ে রাঢ়ীয়

ব্রাহ্মণ ও মেলী কুলীন সমাজের কলঙ্ক বাড়ে। তবে সমাজে নানান সংস্কারবিধি প্রবর্তিত হলেও কন্যাপক্ষের আগ্রহকে ধরে বরপক্ষের অর্থই নিজেদের শ্রেষ্ঠ মূল্য স্থির করে সমাজে অনর্থ ঘটায়। এছাড়া শাস্ত্রগ্রন্থপাঠে জানা যায় পিতামাতাকে গৌরীদানের ফললোভে দারসংগ্রহের ব্যবস্থা করা হলে কন্যাশুল্ক দানরূপ কুৎসিত প্রথা ভীষণভাবে বেড়ে যায়। তবে সকল সময়েই দারকর্ম বা বিবাহ ক্ষেত্রে একপক্ষ অর্থকেই স্বার্থের পরমার্থ করে পাত্র-পাত্রী সংগ্রহে বিভ্রাট ঘটিয়ে সামাজিক সমস্যা তৈরি করে। প্রসঙ্গক্রমে প্রাবন্ধিক এখানে নিজ কন্যার বিবাহ সংবাদ দিয়ে বাস্তবিক সত্য ঘটনাকে তুলে ধরেছেন।

সমসাময়িক সমাজে আরেকপ্রকার জাতিগত সমস্যার কথা শোনা যায়, তা হলো কায়স্থ জাতির উপনয়ন উৎসবাদিতে ব্রাহ্মণ পন্ডিতের বিরূপ ব্যবহার। দেশে যজন-যাজনের ওপরে ব্রাহ্মণদের নির্ভর করতে হত জীবনধারণের জন্য। এই ব্রাহ্মণদের বর্ণবিধান কালে শুদ্র জাতি ছিল অস্পৃশ্য। আর কায়স্থ জাতিকেও শুদ্র জাতি মনে করে। তাই ক্ষত্রিয় মতে উপনয়ন-উৎসবে ব্রাহ্মণরা ক্রুদ্ধ হয়। ক্ষত্রিয় সৃষ্টির প্রসঙ্গে পৌরাণিক কাহিনিতে দেখা যায় ঋষি পরশুরাম বিশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করলে তাদের বিধবাদের গর্ভ উৎপাদন করে ব্রাহ্মণের বরে ক্ষত্রিয় সন্তান জন্ম নিচ্ছে সমাজের মঙ্গলের জন্য। সেকালে ব্রাহ্মণ সমাজে বর্ণসঙ্করের দ্বারা ক্ষত্রিয় অভাব মিটানো যুক্তিযুক্ত, বৈধ, ধর্মশাস্ত্রানুমোদিত ও সমাজগ্রাহ্য ছিল। তাই ঋষি ঠাকুরেরা অসবর্ণা ও ইতরবর্ণা বিধবাদেরও গর্ভ উৎপাদন করতেন। পৌরাণিক সময়ে ঋষি পুঙ্গবেরাই বিধবা ক্ষত্রিয়াদের গর্ভ উৎপাদন করেছেন এবং সৃষ্ট সন্তানদের বর্ণসাঙ্কর্য্যজনিত পাতিত্য বা জাত্যন্তর নাম গ্রহণের রীতি থেকে মুক্ত করে পুণ্যনাম ও কীর্তি দিয়ে মৃত ক্ষত্রিয়াদের বংশধর বলে সমাজে প্রতিষ্ঠা দেবার পথ ব্রাহ্মণেরা করে দেয়। এভাবে পুত্রের জন্মদান এক অসবর্ণা পত্নীর গর্ভজাত সন্তান অপেক্ষা হীনমর্য্যাদার ও নিন্দনীয় হলেও-"প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য কার্য্যং সাধয়েৎ" বিধিমতে ঋষিগণ করতেন, যার প্রচুর উদাহরণ পুরাণে পেয়েছি।

পরশুরাম দ্বারা ক্ষত্রিয় ধ্বংস হলে ব্রাহ্মণেরা নিজেদের বর্ণসাঙ্কর্য্যজাত বালকদের 'ক্ষত্রিয়' বলে পরিচয় দিতে থাকেন। আবার বর্তমান সমাজের বর্ণসাঙ্কর্য্য ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণদের সাহায্যে নিজ লুপ্তবর্ণ উদ্ধার করে ব্রাহ্মণ সমাজকে অশুদ্রযাজী করলেও দোষ নেই। আর সত্য গোপন করে শ্রেষ্ঠবর্ণের জাতিলোপ করে প্রকৃত ক্ষত্রিয়কে কায়স্থ পরিচয়ে নতুন জাতি তৈরি করে ব্রাহ্মণকে আর মিথ্যাচার করতে হবে না। আবার সামাজিক কাজকর্ম তাদের দ্বারা ভালোভাবে সম্পন্ন হয়ে যাবে।

প্রাবন্ধিক ব্যোমকেশ মুস্তফী বাঙালি জীবন-যাপন নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তাদের বেশভূষার পরিচয় দিয়েছেন অষ্টম প্রবন্ধে। বাঙালির সাজপোশাকের ক্ষেত্রে দেখা যায় অনুকরণমূলকতা। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশ ও জাতির মানুষ এদেশে এসেছে। একসঙ্গে বসবাস করার সূত্রে সংস্কৃতির আদান-প্রদান ঘটে। কিন্তু বাঙালি তার নিজস্ব ঐতিহ্যের পরিবর্তন ঘটিয়ে পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য জাতি তথা ইংরেজ, মুসলিম প্রভৃতিদের অনুকরণ করে চলে। এইসব মানুষদের সাজপোশাকের জন্য উপযুক্ত কারণ দেখা যায়। কিন্তু বাঙালিদের বিষয়ে তা লক্ষ্যণীয় হয় না অনুকরণ ভিন্ন। স্বামী বিবেকানন্দ "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার সুত্রে বাঙালির বেশভূষা নিয়ে কথা বলেন।

প্রাবন্ধিক ব্যোমকেশ মুস্তফী রোগশয্যার মধ্যেও একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পাঠকের সামনে এনেছেন। সেটি হচ্ছে দেশের উৎপন্ন শস্য দিয়ে দেশীয় মানুষের গ্রাসাচ্ছদন ভালোভাবে হয় না। প্রধানত অন্ন ও বস্ত্রাভাবের কারণ হিসেবে বলা যায় বিদেশে শস্য রপ্তানি করা এবং বিদেশের তৈরি সুলভ ও সুক্ষ বস্ত্র আমদানি এদেশে। এভাবে দেশীয় শস্য ও অর্থ উভয়ই দু'দিকে বিদেশীদের হস্তগত হয় এবং কালক্রমে শস্য ও অর্থ থেকে বঞ্চিত হয়ে দারিদ্র্য ও অন্নহীনতার স্বীকার হয় দেশের লোক। বিদেশি বণিকগণ শস্যশালী ভারতীয়দের অর্থলোভে লালায়িত করে। জমিদারী ব্যবস্থায় দেশের নিয়ম ছিল যে, উৎপন্ন ফসলের ষষ্ঠাংশ রাজকররূপে গৃহীত হবে। এভাবে প্রজাপালন ও শস্যরক্ষার সুব্যবস্থা থাকলেও অর্থসম্বন্ধ দেশোচিত বিধিব্যবস্থাকে ভেঙে দেয়। ফলে জমিদার ও কৃষক উভয়শ্রেণি অন্নবস্ত্রের অভাব বোধ করে। তাই প্রাবন্ধিক বলেন তার ষোড়শ প্রবন্ধে –

> "এই রূপে প্রজাপালন ও শস্যরক্ষার ব্যবস্থা দেশে ছিল। অর্থসম্বন্ধ হওয়া অবধি সে নিয়ম উল্টাইয়া গিয়েছে। ইহাতে কৃষকশ্রেণীর ধনাগম ও রাজকরের হ্রাস-বৃদ্ধি বা অপ্রাপ্তি-দোষ দূরীকৃত হইয়াছে বটে,

> কিন্তু উভয়েই ধনলাভ করিলেও দেশের কৃষককূলও ধনী হইতেছে না, জমীদারকূলও ধনী হইতে পারিতেছে না, তাহার প্রধান কারণ সেই অন্নবস্ত্রহীনতা।"[২৬]

তাই স্বদেশের অন্নরক্ষা করতে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। এটাও দেশের শস্যবাণিজ্যের একটা মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, যা এদেশীয় মহাজন বা জমিদার শ্রেণির জ্ঞান ও শিক্ষা বহির্ভূত। বিদেশি বণিকদের শস্যসংগ্রহে আগ্রহ ও অর্থব্যয় দেখে বোঝা যায় যে শস্যবিক্রয় না করলে চলবে না। তারা যেমনভাবে অন্নবস্ত্র-সংস্থান করছে, তেমনি আমাদেরও এসবের সংস্থান করতে হবে। নাহলে আমরা দুর্দ্দশার সম্মুখীন হব। এভাবে চলতে থাকলে অন্ন-বস্ত্রের সংগ্রহার্থে আমরা পরমুখাপেক্ষী হয়ে যাব। এক দেশ থেকে মানুষ যদি অন্য দেশে গিয়ে বাণিজ্যের মাধ্যমে ভালোভাবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে, তাহলে এদেশের মানুষকেও বৈদেশিক বাণিজ্য করতে হবে। আর একাজে প্রয়োজন শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়কে। তারজন্য দরকার হলে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক শিক্ষা সংক্রান্ত সমিতি ও সংস্থার সাহায্য নিতে হবে।

এইভাবে প্রাবন্ধিক 'রোগশয্যার প্রলাপ' গ্রন্থে একেকটা অধ্যায়ে বিভিন্ন বিষয়কে নানান বাস্তবিক ঘটনা দিয়ে তুলে ধরেছেন। যেখানে সমাজ-ইতিহাসের অতীত ও বর্তমানকে জানার সঙ্গে সঙ্গে লেখকের গভীর মননশীল চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

Reference:

১. মুস্তফী, ব্যোমকেশ. 'রোগশয্যার প্রলাপ'. শ্রীনলিনীরঞ্জন (সম্পাদিত), কলিকাতা, ১৩৩০, পৃষ্ঠা - ১
২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৭
৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৭
৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৭
৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৮
৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ১০
৭. বসু, রাজনারায়ণ. 'সে কাল আর এ কাল'. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ১৮৭৯, পৃষ্ঠা. - ৩৭
৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৪৪
৯. মুস্তফী, ব্যোমকেশ. 'রোগশয্যার প্রলাপ'. শ্রীনলিনীরঞ্জন (সম্পাদিত), কলিকাতা, ১৩৩০, পৃষ্ঠা - ১৪
১০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ১৪
১১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ১৫
১২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ১৯
১৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ২১
১৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ২৬
১৫. চৌধুরী, প্রমথ. 'প্রবন্ধ সংগ্রহ', (প্রথম খণ্ড), 'বইপড়া', বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, আগস্ট ১৯৫২, পৃষ্ঠা - ১৬৯
১৬.চক্রবর্তী, সুমিত. 'উনিশ শতকের কেরানিকথা'. আনন্দ পাবলিশাস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নভেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা - ১১
১৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ২২
১৮. মুস্তফী, ব্যোমকেশ. 'রোগশয্যার প্রলাপ'. শ্রীনলিনীরঞ্জন (সম্পাদিত), কলিকাতা, ১৩৩০, পৃষ্ঠা - ২৮
১৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৪০
২০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৪১
২১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৪৪
২২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. - ৪৪

২৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৯১
২৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৯২
২৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৫৬
২৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৯৯